নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ২৫-৪০
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ফারহানা সুলতানা*

১. ভূমিকা

মানুষের শেকড়হীনতাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় একটি বাস্তবতা, বিশেষতঃ উত্তর ঔপনিবেশিক[১] বিশ্বায়নের যুগে। গত তিন দশকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে সংঘটিত এবং দৃশ্যমান বাস্তবতা হলো মানুষের 'স্থানচ্যুতি' বা Displacement[২], যা বহুল সংঘটিত প্রক্রিয়া হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মনোযোগ দখল করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মূলতঃ বিশ্বব্যাপী রিফ্যুজি বা স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে, যা নতুন 'প্রসঙ্গ' হিসেবে নৃবিজ্ঞান তথা বৃহত্তর সমাজ বিজ্ঞানে জায়গা করে নিতে থাকে বলে লুবকেমান (2002) দেখান। এছাড়াও বহিরাগত ও অন্তর্গত বা অভ্যন্তরীণ আধিপত্যের কারণেও প্রতিনিয়ত বহু মানুষকে স্থানচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত হতে হয়, যেমন- উচ্ছেদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্বন্দ্ব, সহিংসতা ইত্যাদি।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মূলতঃ উচ্ছেদের ফলে সংঘটিত স্থানচ্যুতির বিভিন্ন ধরণকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে; এ উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে সম্পন্নকৃত মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্থানচ্যুতি, স্থানচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত পুনর্বাসন ও শেকড়ের প্রত্যয়টিকে খোলাসাকরনের মধ্য দিয়ে স্থানচ্যুতি কীকরে একটি নিরন্তর বা চলমান প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে তা দেখানো হয়েছে। স্থানচ্যুতি উচ্ছেদের ফলে সংঘটিত এমন একটি প্রক্রিয়া যা বস্তিবাসীদের গতিশীল জীবনকে আরো গতিশীল করে দেয়। স্থানচ্যুতি কোনভাবেই বস্তিবাসীদের জীবনে নতুন বা শেষ কোন অভিজ্ঞতা নয় এবং ব্যাপকভাবে একে নিশ্চিত করে তোলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। রাষ্ট্র বারংবার বস্তি উচ্ছেদের মাধ্যমে স্থানচ্যুতির একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপট তৈরি করে, ফলে স্থানচ্যুতি বস্তিবাসীদের বারংবার স্থানচ্যুত করার মাধ্যমে একটি চলমান বিষয় হয়ে ওঠে।

২. ক) প্রত্যয় হিসেবে স্থানচ্যুতি

Displacement এর শাব্দিক অর্থ হল স্থানচ্যুতি, যার কারণে মানুষজন তার নিজের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণ অর্থে স্থানচ্যুতি বলতে বোঝান হয়, মানুষের native সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্নতা, যা দৈহিক বাস্তুচ্যুতির মাধ্যমে ঘটতে পারে যেমনঃ রিফ্যুজি, অভিবাসী, উচ্ছেদকৃত ইত্যাদি (Bammer, 1994)। বামার এর মতে, স্থানচ্যুতি একই সাথে খন্ডন বা বিচ্যুতির দ্বৈত অবস্থান। অর্থাৎ এটি এমন একটি 'inbetweenes' অবস্থা যা একই সাথে কয়েকটি স্থানের সাথে যুক্ত থাকা এবং একটি স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ফলে দেখা যায়, স্থানচ্যুতির কারণে মানুষজন তাদের প্রতিদিনকার চর্চা, পরিচিত পরিবেশ, বস্তুগত সম্পদ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয় (সুলতানা, ২০০৯: ২৫)।

---

* গবেষণা সহকারী, স্যানিটেশন সাসটাইনাবিলিটি স্টাডি, বিশ্ব ব্যাংক
ইমেইলঃ farhana_ju@yahoo.com

বামার (1994) স্থানচ্যুতিকে দু'টি বিষয়ের আলোকে দেখতে চান- (১) স্থানচ্যুত হল তারাই যারা নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ফ্যাক্টরের প্রভাবে স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরিতদের তিনি Displacer এবং স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটিকে বলছেন Displacement এবং (২) তারাও স্থানচ্যুত যারা কিনা ঔপনিবেশিকতা ও বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে নিজ সংস্কৃতি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে তাদের Native সংস্কৃতিরও স্থানচ্যুতি ঘটে।

যদিও Displacement কে বাস্তুচ্যুতির সমার্থক ধরা হয় তথাপি উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণত স্থানচ্যুতির কারণে স্থানচ্যুত মানুষেরা তার নিজস্ব স্থান ও বসতভিটা উভয়ই হারিয়ে স্থানচ্যুত এবং বাস্তুচ্যুততে পরিণত হয়। অন্যদিকে বাস্তুচ্যুতি হলো কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির বাস্তুহারার অভিজ্ঞতা (সেটা ভূমিধ্বস বা ভূমিকম্পের মাধ্যমেও ঘটতে পারে) এবং এখানে ঐ জনগোষ্ঠি বাধ্যতামূলক ভাবে স্থানান্তরিত বা স্থানচ্যুতির শিকার হয় এমন নয়। অর্থাৎ স্থানচ্যুতির শিকার জনগোষ্ঠি বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তুচ্যুতির শিকার হয় কিন্তু বাস্তুচ্যুত জনগণ যে স্থানচ্যুত এমন নাও হতে পারে। যদিও এসব বিষয়াবলী নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে।

খ) জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও স্থানচ্যুতি

অভিবাসন অধ্যয়নে 'স্থানচ্যুতি' এক ধরনের জোরপূর্বক অভিবাসনের অভিজ্ঞতাকে সামনে আনে। বৃহত্তর অর্থে জোরপূর্বক অভিবাসনের তিনটি ভিন্ন কিন্তু আন্ত:সম্পর্কিত ধরণের কথা বলা যায়; (১) দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত স্থানচ্যুতি- যেসব মানুষ অস্ত্র কেন্দ্রীক যুদ্ধ যেমন; সিভিল ওয়ার, সাধারণ সহিংসতা, জাতীয়তা থেকে নিগৃহীত হওয়া, বর্ণ, ধর্ম বা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করার জন্য উচ্ছেদকৃত হয় তখন তাকে দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত স্থানচ্যুতি বলা হয়। (২) উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থানচ্যুতি- এর ফলে সৃষ্ট স্থানচ্যুতরা হল সে ধরনের মানুষ যারা উন্নয়নের নানা নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে নিজ স্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এ প্রেক্ষিতে বৃহদাকারের infrastructure যেমন; বাঁধ, রাস্তা, বন্দর, নগর পরিচ্ছন্নতা অভিযান, খনন, বনশুন্য করা বা biosphere প্রকল্প সমূহের কথা বলা যায়। (৩) দুর্যোগজনিত স্থানচ্যুতি- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন; বন্যা, আগ্নেয়গিরি, ইত্যাদি), প্রতিবেশগত পরিবর্তন (বন উজাড় হওয়া, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি) এবং মনুষ্য সৃষ্টি দুর্যোগের (শিল্পায়নে দুর্ঘটনা, radioactivity) কারণে এই ধরনের স্থানচ্যুতির শিকার হতে হয়।

বস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিশাল জনগোষ্ঠিকে কোন পুনর্বাসন ছাড়াই আইনীভাবে গৃহহীন করে তাদের ঝুকিপূর্ণভাবে জীবন যাপনে বাধ্য করা হয় (Chore and Achr 2000)। ঐতিহাসিক ভাবে ঢাকায় জোরপূর্বক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া দু'টি ভিন্ন ধারায় ঘটে। নজরুল ইসলামের মতে, প্রথম ধারাটি ১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ঘটে (Chore and Achr 2000: 14)। অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় বস্তির সংখ্যা বেশি ছিল। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধীদের ধরার জন্য বস্তি

উচ্ছেদ করতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধার আশায় গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ কম মজুরীতেও শহরে আসা শুরু করে। এক্ষেত্রে তাদের গন্তব্য ছিল ঢাকা, যেখানে তাদের উদ্বাস্তুদের মত বাস করতে হয়। ফলে, এদের স্থান হয় তথাকথিত অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র বা বস্তিতে (Chore and Achr 2000) ।

উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়না। ১৯৭০ সালের Government local authority and building (Recovery of possession) ordinance xxiv- এর ধারা ৫ অনুযায়ী উচ্ছেদের আগে ৩০ দিনের সমন জারি করার আইন থাকলেও এক বা দুই দিন পূর্বে মাইকের সাহায্যে ঘোষনা দেয়া হয় (রশীদ, ২০০৬)। যার ফলে বস্তিবাসীরা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায় না (Chore and Achr 2000)। বাংলাদেশের জাতীয় গৃহায়ন নীতি (১৯৯৩) জোরপূর্বক উচ্ছেদ রোধ করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেখানে বলা হয়, সরকার যতদুর সম্ভব উচ্ছেদ এবং স্থানচ্যুতি রোধ করবে, কিংবা উচ্ছেদকৃতদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বা বস্তি আপগ্রেডিং করবে, কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। বরং উচ্ছেদের পেছনে সরকার বা রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রভাব কাজ করে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতা চর্চার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে (Chore and Achr 2000) ।

উচ্ছেদ সম্পর্কিত গবেষণায় রশীদ (২০০৬) কল্যানপুর বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন। "বস্তি ভাঙ্গে আর বস্তিবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজে" এই ধারণাকে তিনি খারিজ করে দেখাতে চান বস্তিবাসীরা বস্তি ভাঙ্গলে কেবল পালিয়েই যায় না বরং প্রতিরোধও করে। এই প্রতিরোধকে তিনি দূর্বলের প্রতিরোধ বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া উচ্ছেদ ও স্থানচ্যুত বস্তিবাসীরা যে পুনরায় বস্তিতে ফিরে এসে বসতি স্থাপন করে তাকে তিনি 'পাথর কুচির ঝরে যাওয়া' পাতার সাথে তুলনা করেন।

৩. নৃবিজ্ঞান ও স্থানচ্যুতি অধ্যয়ন

মানুষের গতিশীলতা ও স্থান নৃবিজ্ঞানের পাঠের বিষয় হিসেবে অনেক আগেই মনোযোগে এসেছে। অর্থনীতিবিদরা যেখানে এহেন গতিশীলতাকে অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানিক বিষয় হিসেবেই বেশি উপলব্ধি করে, সেখানে ঐতিহাসিকভাবে নৃবিজ্ঞান একে কাঠামোগত (structural) কোন বিষয় নয় বরং চলমান, নিরন্তর ও অনবরত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠ করে। কুলসনের (2003) মতে, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা উচ্ছেদের শিকার স্থানচ্যুতদের জীবনের অনিশ্চয়তা ও তাদের টিকে থাকর সংগ্রাম সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয়। তাই নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা স্থানচ্যুতদের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় আদিবাসী আমেরিকানদের উপর গবেষণা করেই আজকের নৃবিজ্ঞান উন্নীত হয়েছে; যেখানে আদিবাসীদের আবাসস্থল কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, জমি কিভাবে বেদখল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয় গুলোকে নৃবিজ্ঞানীরা পাঠ করে। ফলে নৃবিজ্ঞানের শুরু থেকে সাম্প্রতিক সময়েও রিফ্যুজি এবং অন্যান্য জোরপূর্বক

অভিবাসীতদের নিয়ে অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষত আমেরিকা সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের নৃবিজ্ঞানীরা এর পথিকৃত ।

বৃহত্তর পরিসরে নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বে এবং প্রত্যয়ের ভিতর দিয়ে স্থানচ্যুতিকে একটি প্রক্রিয়া এবং সমস্যা হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়। অনেকে স্থান, স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডের সীমাবদ্ধতাকেও তুলে ধরেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মালকি (1997), ক্লিফোর্ড (1997), গিয়ার্জ (1983) গুপ্ত ও ফার্গুসন (1992, 1997), সাঈদ (1978) প্রমুখ। এদের মতে, নৃবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক প্রবণতা হল স্থানের সাথে কোন সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেখা। ফলে, স্থানচ্যুতিকে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার একটা প্রবণতা থেকে যায়। স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে তাই উত্তর ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে অনেকে প্রাধ্যান্য দেন, যেমন- গুপ্ত ও ফার্গুসন (1997)। আবার অনেকে স্থানচ্যুতিকে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সীমানা বা পরিচিতির বাইরে নির্মাণ করতে চান, যেমন- মালকি (1997)। লুবকেমান (2002) যেমন একে একটি "strategic research site" বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে চান, যা বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে যুক্ত[৩]।

ক) উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে স্থান ও স্থানান্তর

ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক ব্যবস্থাই মূলত: ঔপনিবেশিক যুগ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিকতা এবং উপনিবেশকালীন সময়ে উপনিবেশিত মানুষজনের অভিজ্ঞতা, জীবনব্যবস্থা এবং ভাবনা চিন্তার ধরণকে বোঝার প্রতি দৃষ্টি দেয় (Gupta and Ferguson, 1997)। এক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় যে, উপবেশিক সময় কালে পুরো বিশ্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞান উৎপাদিত হয় তার রাজনৈতিক অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যকে উন্মোচন করা। ফলে বিদ্যাজগতে প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট জ্ঞান ও তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। নৃবিজ্ঞানে এসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন ক্লিফোর্ড ও মার্কুস (1986), তালাল আসাদ (1973), এডওয়ার্ড সাঈদ (1978), অখিল গুপ্ত এবং জেসম ফার্গুসন (1997)।

উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি তাই space, place, culture, displacement, post-coloniality, hyperspace ইত্যাদি ধারণায়নের মাধ্যমে স্থান ও স্থানান্তরের প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। উপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতার কারণে উপনিবেশিত ও উপনিবেশকারী সমাজ পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যকার সংযোগ ও মিথস্ক্রিয়া নতুন বাস্তবতার জন্ম দেয়। যেমন; অনেক উপনিবেশিত জনগন তাদের homeland ছেড়ে colonial state এ পাড়ি জমায় (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন উপনিবেশিত সিলেটের জনগন জাহাজের লস্কর হিসেবে ১৯ শতকে ব্রিটেনে পাড়ি জমায়)। ফলে স্থানান্তরিত মানুষজন নতুন বাস্তবতা বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে দু'দিক থেকে স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করে; (১) মাতৃভূমির ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে স্থানের বিচ্যুতি ঘটায় এবং (২) নিজ ভাষা ত্যাগ করে colonial state এর ভাষা গ্রহন করার মাধ্যমে নতুন বাস্তবতাকে মোকাবেলার মুখোমুখি হয়। Homeland এ তারা নিজ ভাষা

ব্যবহার করে স্থানিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতো এবং চারপাশের জগতকে ব্যাখ্যা করতো। কিন্তু স্থানান্তরিত হবার কারণে তারা নিজ ভাষা ও স্থানের সাথে সাথে নিজ অভিজ্ঞতা থেকেও বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত মানুষজনের উপলব্ধিকে বোঝার জন্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ধারণায়নকে অপর্যাপ্ত মনে করেন উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা। যেমন; গুপ্ত ও ফার্গুসন (1992) বলেন প্রথাগত নৃবিজ্ঞানে বরাবরই space ও culture কে কাঠামোবদ্ধ সম্পর্কে বেঁধে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়; যেমন- কালাহারিতে !কুং বুশম্যানরা বাস করে যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে এহেন বর্ণনা । কিন্তু লেখকদ্বয় দেখান সীমান্তে বসবাসকারী মানুষজন কোন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে না বরং দৈনন্দিন চর্চায় স্থান ত্যাগ করতে থাকে। যেমন- মেক্সিকান কৃষকরা আধা বছর মেক্সিকোতে এবং অন্য আধা বছর আমেরিকাতে বসবাস করে। ফলে গুপ্ত ও ফার্গুসন (1997) সংস্কৃতি ও স্থানের অনিবার্য সম্পর্ককে দেখার প্রথাগত প্রবণতাকে খারিজ করার পাশাপাশি একটি locality'তে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও subculture[৪] কে চিহ্নিত করতে না পারার নৃবৈজ্ঞানিক প্রবণতাকে সমালোচনা করেন। তাদের মতে, multiculturalism[৫] এর যুগে সংস্কৃতির অখন্ড ও বিশুদ্ধ স্বরুপ দেখা যায় না; বরং আন্ত:সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া এই বিভাজনকে আড়াল করে ফেলে। আবার post-coloniality সেই পরিসরকে তুলে ধরে যাতে colonial ও colonized মানুষজন hybrid culture[৬] এর অখন্ড সংস্কৃতির দিকে ধাবিত হয় এবং সেই সংস্কৃতিকে একটি place বা স্থানে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। লেখকদ্বয় জাতিরাষ্ট্রগুলোর সীমা-পরিসীমার যে মানচিত্র আছে সে দিকেও দৃষ্টিপাত করে দেখান যে, বিশ্ব মানচিত্রে জাতিরাষ্ট্রের যে ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করা হয় তা ততটা স্থির নয়। যেমন; যদি আমেরিকীয় সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে ইউএসএ'র ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ করে ফেলা হয় তবে, ইউএসএ তে বসবাসরত অন্যান্য মানুষজনের সংস্কৃতি আড়াল হয়ে যায়। স্থান ও স্থানান্তরকে বোঝার এহেন উত্তর উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রথাগত নৃবিজ্ঞানের সংস্কৃতিকে স্থানের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়নের প্রতিষ্ঠিত মৌলিক ধারণাকে বিতর্কিত করে তোলে।

খ) স্থানচ্যুতি ও শেকড়ের প্রত্যয়

সাম্প্রতিক সময়ে শেকড় বা উৎস খোঁজার চিন্তাভাবনা নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের অনুসন্ধানের বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং এতে সীমানার মধ্যে পরিচিতি নির্মানের ধারণাকে প্রশ্নায়িত করা হয় (Malkki, 1997)। মালকির মতে, রুপক অর্থেও কোন উৎস বা শেকড় থাকাটা মানুষ এবং স্থানের মধ্যকার যোগাযোগকে ইঙ্গিত করে এবং এই যোগাযোগের ধারণা বর্তমানে নৃবিজ্ঞানে উত্তোরোত্তর ভাবে 'Denatured Area' হিসেবে পুনরালোচিত হচ্ছে।

অনেক নৃবিজ্ঞানী যেমন- আপ্পাদুরাই (1988, 1990), সাঈদ (1978), ক্লিফোর্ড (1988, 1994), রোজাল্ডো (1989), লফগ্রেন (1989), মালকি (1994), গিলরয় (১৯৯৩), হল (1990) দেখিয়েছেন যে, nativeness বা native place এর ধারণাগুলো অনেক বেশি

জটিল এবং অনেক মানুষই নিজেদের পরিচিতিকে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখন্ডের বাইরেও নির্মাণ করে, যেমন- ডায়াসপোরা সম্প্রদায়[৭] (Malkki, 1997)। এজন্য সাঈদ (Said 1979:18) বলেন "হোমলেসনেসের সাধারণ অবস্থা সর্বত্রই সমসাময়িক জীবন ধারণকে চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়"। ফলে, একদিকে স্থানচ্যুত বা রিফ্যুজিদের জন্য নির্দিষ্ট homeland বা nation দাবী করা হয়, অন্যদিকে এটা করতে গিয়ে স্থানচ্যুত ও রিফ্যুজিদের অধ্যয়নকারী রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যক্তিরা এদের জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার বস্তুতে পরিণত করে। মালকি (1997) স্থানচ্যুতি ও উৎসহীনতার সাধারণ অর্থ বোঝার জন্য প্রথমেই দেশ ও উৎস এবং জাতি ও জাতীয় পরিচিতির মধ্যে সম্পর্ক তৈরির ধারণাকে প্রশ্নায়িত করতে চান। তাঁর মতে, মানচিত্র দ্বারা ভূখন্ড বা সীমানা প্রত্যয়টিকে দৃশ্যায়িত করা হয়। এই প্রত্যয়টি জাতির ধারণাকে বিভিন্ন ভাষাভাষিদের কাছে 'দেশ', 'মাটি' বা 'ভূমি'র সমার্থক করে তোলে। মালকি (1992) বলেন, The whole country দ্বারা একটি দেশের ভূখন্ড এবং সেখানে বসবাসকারী সকল জনগণকে বোঝায়, আবার Land দ্বারা যেমন মাতৃভূমি (homeland) বোঝায় তেমনি এটি থাইল্যান্ড, ইংল্যান্ড বা নুয়েরল্যান্ড বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। মালকির মতে, 'মাটি' প্রত্যয়টিকেও একই ভাবে 'জাতির মাটি বা নিজ দেশের মাটি' হিসেবে তুলনা করা হয়, যার দ্বারা মানুষের সাথে স্থানের একটি যোগাযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। আবার অনেক সময় অভিবাসী বা নির্বাসিত ব্যক্তিরা একমুঠো দেশের মাটি নিজের সাথে রাখার মাধ্যমে, কিংবা অন্যদেশে মৃত্যু বরনকারীদের দেহ বা দেহভস্মকে তার নিজ দেশে ফেরৎ আনার মাধ্যমে স্থানের সাথে মানুষের যোগসূত্রীতাতাকেই তুলে ধরা হয়।

গ) জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন একটি চলমান প্রক্রিয়া

সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা, উচ্ছেদ, রিফ্যুজি, স্থানচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব কাছাকাছি চলে এসেছে (Colson, 2003)। একবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক জনবিস্ফোরণ, ক্রমবর্ধমান হারে সম্পদ নিঃশোষিত হওয়া এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এ কারণে অনেক সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় উচ্ছেদ, স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন ইত্যাদিকে একটি চলমান প্রক্রিয়া বলছেন (Colson 2003, Jing 1996)|

কুলসন (2003) এথনোগ্রাফীক উপাত্তের সাহায্যে জোরপূর্বক অভিবাসন, এর ফলে সৃষ্ট স্থানচ্যুতি ও তাদের পুনর্বাসন যে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দীর্ঘায়িত হয় তা দেখান। লেবাননে ৫০ বছর ধরে প্যালেস্টাইনের যে উদ্বাস্তুরা বসবাস করছে তারা ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে নিজেদের পরিচিতি ও অসংগঠিত অবস্থাকে পুনর্গঠন করার জন্য প্রতিরোধের আন্দোলন গড়ে তোলে। এবং এটা করতে গিয়ে তারা এক ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস (shared history) তৈরি করে। এই অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস উদ্বাস্তু কিংবা অন্য যে কোন ধরনের জোরপূর্বক অভিবাসীতদের নিজ 'হোম' থেকে বিতাড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতাকে একীভূত করে।

পিটিট (1995) ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবির ও সম্প্রদায়ের এথনোগ্রাফীক উদাহরণ টেনে দেখান যে, এরা তাদের নিজস্ব স্থান (যেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে) এবং নির্বাসিত স্থান (যেখানে তারা বসবাস করছে) উভয় স্থানের (space/place) সাথে ক্রমোচ্চভাবে আন্ত ঃসম্পর্কিত থাকে। এরা তাদের স্থানচ্যুত অবস্থার পরিচিতি একটি বিশেষ স্থানের সাথে সম্পর্কিত করে নির্মাণ করে যে তারা ফিলিস্তিনী । অন্যদিকে কুলসন দেখাতে চান যে, পুনর্বাসন কখনও স্মৃতিকে মুছে দেয় না বরং শেকড়হীন, স্থানচ্যুত বা বিতাড়িত মানুষজনের নতুন ধরনের পরিচিতি (New forms of Identity) নির্মানে স্মৃতি গুলো অংশীদারিত্বমূলক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এই ধরনের স্মৃতি আবার একই সাথে তাদের মধ্যে ঘরে ফেরার মিথ তৈরি করে (Malkki, 1995)। তাই শেকড়হীন হয়ে অন্যত্র সরে যাওয়া এবং পুনর্বাসনের পরও স্থানচ্যুতরা নিজেদের নতুনভাবে নতুন সম্প্রদায় ভূক্ত করে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণ করে, যা লেবেলিং, পরিচিতি নির্মান, সীমানা নির্ধারন ও তা ধরে রাখা, বিনিময় ব্যবস্থাপনা, অংশীদারীত্ব মূলক অভিজ্ঞতা, মিথ তৈরি এবং বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে (Colson, 2003)।

৪. ক) বেড়িবাঁধ বস্তি

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরের বেড়িবাঁধ বস্তিটিকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই বস্তিটি মূলতঃ সরকারী জমি দখল করে যৌথ ব্যক্তি মালিকানায় একটি ঝিলের উপরে টং বেঁধে তৈরি করা হয়েছে। এতে ঘরের সংখ্যা প্রায় ১০০ এবং মালিকের সংখ্যা সাত জন। বস্তিবাসীদের ৯৯ ভাগই ভোলা থেকে আগত জনগন এবং গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে বারংবার উচ্ছেদের শিকার ১২টি গৃহস্থালীর সদস্যদের মধ্যে যারা ভোলা থেকে নদী ভাঙ্গনের কারণে আভিবাসন ঘটিয়েছে।

স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে এখানে গবেষিতদের অনুধাবনকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে মাঠ কর্ম, প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক (নিবিড় পর্যবেক্ষণ, গবেষিতদের নিত্য দিনের চর্চায় অংশগ্রহণ, সাক্ষাৎকার, আলোচনা ইত্যাদি) এবং অভিবাসন গবেষণা পদ্ধতিসমূহকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে [যেমন- অভিজ্ঞতা (Experience) গল্পগাঁথা (Stories) স্মৃতি (Memory) বয়ান বিশ্লেষণ (Narrative Analysis) ইত্যাদি]। এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন স্থানচ্যুতদের অতীত নির্ভর বিষয়াবলী সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে, তেমনি তাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাও এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গবেষিতদের ভাষ্য অনুযায়ী স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বহুবার এই বস্তিটি উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। তবে বিভিন্ন কেইস থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষিতদের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী বলা যায় বস্তিটি মূলতঃ চার বার উচ্ছেদকৃত হয়েছে এবং সর্বশেষ উচ্ছেদ কার্যক্রমটি চালানো হয় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এই উচ্ছেদের পরপরই আলোচ্য গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

ঢাকার বস্তিগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ বৈধ ও অবৈধ। রশীদ (২০০৬) দেখান ঢাকার ৩৫ ভাগ বস্তি অবৈধ এবং বাদবাকী ৬৫ ভাগ বৈধ। অবৈধ বস্তিগুলো সাধারণত পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী

প্রতিষ্ঠানের পতিত বা অব্যবহৃত জায়গায় গড়ে উঠেছে, যার স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই। বৈধ বস্তিগুলো সাধারণত ব্যক্তি বা পারিবারিক ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিকেই নানা সময়ে অপরাধ দমন, নগর উন্নয়ন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে উচ্ছেদ করা হয় এবং এতে অংশ নেয় রাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ। বেড়িবাঁধ নির্মানের পর সরকারী পরিত্যাক্ত ঝিলের উপর বস্তিটি গড়ে ওঠে বলে একে অবৈধ বলা যায়।

উচ্ছেদের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতই এটিও ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত ক্ষমতা চর্চা ও বলপ্রয়োগের একটি অংশ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন র‍্যাব ও মোহম্মদপুর থানার পুলিশ সহ (বস্তিবাসীদের মতে হাজার হাজার পুলিশ সহ) উচ্ছেদের দিন সকালে বুলডোজার নিয়ে টংয়ের উপর গড়ে ওঠা বস্তিটির যতটা সম্ভব গুড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঝিলের উপর থাকা বস্তির বেশ কিছু ঘর বুলডোজার স্পর্শ করতে পারেনি বলে তাৎক্ষনিক ভাবে অনেকে উচ্ছেদের ক্ষতিগ্রস্থতার কবল থেকে বেঁচে যায় এবং ঐ রাতে বস্তিতেই থেকে যায়। মাঝরাতে পুলিশ এসে এদের উচ্ছেদের স্থান না ছেড়ে যাওয়ায় মারধোর করে, ফলে প্রকৃতপক্ষে এরাই ক্ষমতা চর্চার দৃশ্যমান অংশটির শিকার হয়। উচ্ছেদের পর পরই তাই বস্তিবাসীরা খোলা মাঠে বা গাছ তলায় বসবাসের জায়গা খুঁজে নেয়।

খ) পুনর্বাসনের নতুন ধরণ হিসেবে 'আত্ম পুনর্বাসন'

স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত বেশিরভাগ গবেষণাতেই একে দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রান্তিকতা হিসেবে বর্ণনা করে তাদের জন্য সরকার কর্তৃক পুনর্বাসনের সুপারিশ করা হয় (যেমন ঠাকুরতা ও বেগম, ২০০৫)। কিন্তু স্থানচ্যুতরা যে কেবলমাত্র সরকারের পুনর্বাসনের আশায় বসে না থেকে নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বা আত্ম পুনর্বাসন ঘটায় তা প্রায়শই দেখা হয় না। এটি পুনর্বাসনের এমন একটি প্রক্রিয়া যা বস্তিবাসীরা নিজ উদ্যোগে ঘটায়। রয় (2001) পশ্চিম বাংলার বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর উদাহরণ দেন। তিনি দেখান ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা তাদের জ্ঞাতিদের নেটওয়ার্ক এবং নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে পশ্চিম বঙ্গে নিজেদের আবাসন ঘটান। অনুরুপভাবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ বা মানবাধিকার সংস্থাগুলো বেড়িবাঁধ বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলেও বস্তিবাসীরা নিজ উদ্যোগেই আত্ম পুনর্বাসন ঘটায়। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান হাতিয়ার হলো ঘর মালিকদের সাথে যোগাযোগ ধরে রাখা এবং বস্তির প্রতি তাদের শেকড়ের টান; যা অভিবাসিত বস্তি বাসীদের জন্য পরিচিতি, সামাজিক নিরাপত্তা জাল, নেটওয়ার্ক বন্ধন তৈরি করে তাদের সামাজিক পুঁজিকে[৮] ত্বরান্বিত করে। মেহতা এবং গুপ্তে (2003) মনে করেন সামাজিক এহেন যোগাযোগ এবং বন্ধনগুলো উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে ঘর মালিকদের যেহেতু বস্তিতে ঘর তোলা এবং ভাড়া দেয়া একটি ব্যবসা তাই তারাও বস্তি পুনরায় গড়ে তোলার জন্য উৎগ্রীব থাকে। ঘর মালিকেরাও ভোলা থেকে অভিবাসীত বলে ঘর ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য

দেয় ভোলার কোন পরিবারকে। আবার সামাজিক নেটওয়ার্ক ধরে রাখার জন্য পুরানো ভাড়াটিয়ারাও প্রাধান্য পায়। ফলে, আত্ম পুনর্বাসনের বিষয়টি তরান্বিত হয়।

গ) বস্তির শেকড়ের টানে

নৃবিজ্ঞানীরা বৃহত্তর অর্থে ডায়াসপোরা বা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে শেকড়হীনতার উদাহরণ সামনে আনলেও গবেষিত স্থানচ্যুত বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে তা ভিন্নতা তৈরি করে। বস্তিবাসীরা ভোলা থেকে অভিবাসিত জনগণ, ফলে প্রাথমিক অনুধাবনে তারা পূর্ব হতেই শেকড়হীন দল। যারা বস্তির মধ্যে নিজেদের পরিচিতির একটি বোধ লালন করে। এখানে তারা পরিচিতির এমন এক ধরনের সামাজিক জাল গড়ে তুলেছে, যা থেকে বের হওয়াকে নিজেদের বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বের প্রতি হুমকি বলে মনে করে। এরা বস্তিতে ঢাকার ভাষায় কথা না বলে ভোলার ভাষায় কথা বলে একে অপরের সুখ, দুঃখকে ভাগাভাগি করে নেয় বা বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। তাই একদিকে ভোলা বা নিজ উৎস থেকে শেকড়হীনতার বোধ এবং অন্যদিকে বস্তির প্রতি টান শেকড়ের দ্ব্যর্থক অনুধাবন ঘটায়। এই বিষয়টি মালকির (1997) স্থানের প্রতি রূপক অর্থে যোগাযোগের ধারণাটি তুলে ধরে। কেননা বস্তিবাসীদের মধ্যে বস্তির প্রতি যে টান তা তাদের পরিচিত গন্ডির মধ্যে টিকে থাকার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। অন্যদিকে বস্তিবাসীরা প্রতিনিয়িতই ভোলার সাথে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে কিন্তু ভোলা ফিরে যেতে চায় না। এর মূল কারণ হলো স্থানের ক্ষমতা। অর্থাৎ ঢাকা এমন একটি স্থান যেখানে তারা অন্তত রুটিরুজির ব্যবস্থা করতে পারে, যা তাদের আয় বা বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে তাদের গন্তব্য হলো বেড়িবাঁধ বস্তি। গার্ডনার ও আহমেদ (2006) স্থানের এহেন ক্ষমতাকে নির্দেশ করেন সিলেটের বিশ্বনাথ গ্রামের প্রেক্ষিতে; যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে অনেক মানুষ অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটায়। কারণ এখানে অন্যান্য স্থানের চেয়ে দৈনিক মজুরী অপেক্ষাকৃত বেশি এবং অন্যান্য অনেক সুবিধাও রয়েছে।

বস্তিবাসীদের মধ্যে বেড়িবাঁধ বস্তি থেকে বিতাড়িত হওয়ার তাড়না সবসময়ই থাকে। তারপরও তারা এই বস্তিতেই আবাসস্থল গড়ার বা ফিরে আসার তাগিদ বোধ করে। তাই উচ্ছেদের পর বস্তিবাসীরা উচ্ছেদকৃত বস্তির আশাপাশেই প্লাস্টিক, পলিথিন দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে অবস্থান করে। কারণ তাদের লক্ষ হলো পুনরায় বস্তি স্থাপিত হলে সেখানে আবার বসতি স্থাপন করা। বস্তি উচ্ছেদের পরও বস্তিবাসী মানুষ সাময়িক সময়ের জন্যও গ্রামে ফিরে যায় না। বরং গ্রামে তাদের যে আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদের ঢাকায় এবং নির্দিষ্ট ভাবে যে বস্তিতে তারা বাস করে সেখানে নিয়ে আসে। কারণ ঢাকা থেকে সাময়িক বিচ্যুতিও অর্থনৈতিক ভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে তাদের ধারণা। এভাবে বস্তিতেও তারা নিজ এলাকা ও সম্প্রদায়ের বোধকে লালন করে।

আবার অনেকে রয়েছেন যারা বেড়িবাঁধ বস্তি উচ্ছেদের সময় থেকে এখানে থাকছেন। যদিও বস্তি তাদের জন্মস্থান নয় তবু এই বস্তির প্রতি তারা টান অনুভব করেন। একজন গবেষিত বলেন, "অনেক দিন ধরে আছি; তাই মায়া পড়ে গেছে"। এই বিষয়গুলোকে মালকির (1992, 1997) শেকড়ের প্রত্যয়ের সাথে মিলিয়ে দেখা যায়। যেহেতু বস্তিবাসীরা

বারংবার উচ্ছেদের শিকার হয় তাই তারা বারংবার শেকড়হীন হয়ে পড়ে। তবু তারা এই বেড়িবাঁধ বস্তির সাথে নিজেদের নাড়ির টান অনুভব করেন। তাই রূপক অর্থে এই শেকড়ের অনুভব বস্তিবাসী ও বস্তি অর্থাৎ মানুষ এবং স্থানের মধ্যকার যোগাযোগকে তুলে ধরে। আবার শেকড়হীন এসব বস্তিবাসী মানুষের বেড়িবাঁধ বস্তির প্রতি টান নিজ ভূখন্ডের (ভোলা) বাইরে home নির্মাণ করার ধারণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। কেননা এইসব বস্তিবাসীদের জীবন অনেক বেশি গতিশীল, তারা জানেনা তাদের ঠিকানা কোথায়। এজন্য তারা যেমন সবসময় হোমলেস এবং শেকড়হীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়; তেমনি আবার শেকড় খুঁজতে থাকে বস্তির মধ্যেই। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বস্তির প্রতি তাদের টান বা শেকড় খোঁজার তাড়না বোধ তারা মূলতঃ নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে বা টিকে থাকার কৌশল হিসেবে করে। তাই প্রতিনিয়ত শেকড়হীন হয়েও এরা শেকড় খোঁজে পরিচিত স্থান ও সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যে।

ঘ) স্থানচ্যুতি গভার্নমেন্টালাইজেশন (governmantalization) প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ

ফুঁকো (2001) ক্ষমতা ও জ্ঞান ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে মৌলিক বোঝাপড়া দাঁড় করান তার উপর ভিত্তি করেই তার গভার্নমেন্টালাইজেশন সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়েছে। উচ্ছেদ প্রক্রিয়া এবং স্থানচ্যুতি গভার্নমেন্টালাইজেশনের অংশ হিসেবে খোদ স্থানচ্যুত বস্তিবাসী দ্বারাই স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া লাভ করে; যা কিনা আবার তাদের প্রতিরোধের ভাষাকেও নীরবতায় পরিণত করে। ফুঁকোর মতে, ১৬ শতক থেকেই গভার্নমেন্টালাইজেশন শাসনের একটি নতুন কৌশল হিসেবে সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিতে শাসনের ক্ষেত্রে একসারি নিয়ম বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট হয় কীভাবে, কে শাসন করবে কিংবা কারা বা কে করবে না। এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হল কেবল সমাজ নয় বরং সমাজের সমস্যাও এই প্রক্রিয়ার অধীন। আধুনিক শাসন ব্যবস্থার প্রথমদিকে government বা সরকার তার governance বা শাসনের জন্য ব্যক্তির আচরণ ও তার প্রাত্যহিক কাজ কর্মকে নিয়ন্ত্রন করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষকে জানা ও তাকে শৃঙ্খলায়িত করা প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যবস্থা এই নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে কাজ করে। ফলে সরকার এর বিস্তার ঘটে টেকনিক্যাল ও প্যাসটোরাল উভয় ক্ষেত্রে (Foucault, 1988)। এজন্য সরকার গনস্বাস্থ্য, পয়ঃনিস্কাশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন এসব কার্যক্রম হাতে নিয়ে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চর্চা সমূহে ঢুকে পড়ে ও হস্তক্ষেপ ঘটায়। একই সাথে সরকার নানান নিয়ম নির্দিষ্ট করে কোনটা স্বাভাবিক আচরণ এবং কোনটা অস্বাভাবিক তা ঠিক করে দেয়। তাই আধুনিক সমাজে সরকার এর ক্ষমতার এই ব্যাপৃত কৌশল ব্যাক্তির আত্মার উপর কাজ করে। আধুনিক সমাজে শাসন যেভাবেই চিহ্নিত বা বিস্তৃত হোকনা কেন শাসন চর্চায় ব্যক্তি স্বতন্ত্রকরণ, ব্যক্তিকীকরণ ও স্বাভাবিকরণ নিয়মের অবরুদ্ধতায় গড়ে ওঠে (Gordon, 1991)। আধুনিক সমাজের স্বাভাবিকীকরণ মূলতঃ ক্ষমতার খেলা; যা ব্যক্তি মানুষের চিন্তা, চর্চা ও কাজকে গঠন করে।

তাই যখন বিশেষায়িত জ্ঞান দ্বারা উচ্ছেদকে বিভিন্ন গবেষণায়, প্রবন্ধে বৈধতা দেয়া হয় তখন রাষ্ট্র যন্ত্র নগর উন্নয়নের নামে অবৈধ বস্তি উচ্ছেদের জন্য তার বিভিন্ন মেকানিজমের

সাহায্যে ক্ষমতার চর্চা করে। অপরদিকে প্রতিটি সরকার গঠনের পর উচ্ছেদাভিযান দ্বারা একে স্বাভাবিকীকরণ করা হয় এবং গভার্নমেন্টালাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শাসিত, অর্থাৎ খোদ বস্তিবাসীও এই স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন তারা ১৫ বছরের মধ্যে ৩/৪ বারেরও বেশি উচ্ছেদের শিকার হন। কেবল অতীত অভিজ্ঞতাই নয়; ভবিষ্যতেও তারা যে উচ্ছেদকৃত হবে সেই সম্পর্কে তারা অবগত থাকে। ফলে তারা স্থানচ্যুতিকে নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রের গভার্নমেন্টালাইজেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

উচ্ছেদের পরও পুণরায় বস্তিতে বসতি গড়া থেকে পুণরায় বিতাড়িত হওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে গবেষিতরা বলে "এখন আর উঠাইবোনা, উঠাইলে উঠাইবো যখন নতুন সরকার আসবো তখন।" উচ্ছেদ সম্পর্কে এহেন কঠিন বাস্তবতা মূলতঃ আধুনিক সমাজের গভার্নমেন্টালাইজেশন প্রক্রিয়ার কারণেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে যা শাসন (এক্ষেত্রে উচ্ছেদ বোঝাতে) ও শাসিতের (বস্তিবাসীদের অনুধাবনে উচ্ছেদকে মেনে নেয়া এবং বারংবার স্থানচ্যুত হওয়ার ধারণায়) অংশগ্রহনের ফলাফল। এটি শাসিতের প্রতিরোধের ভাষাকেও নীরব করে তোলে, যেমন একজন তথ্যদাতার কাছে উচ্ছেদ হওয়া, স্থানচ্যুত হয়ে পড়া এবং ঘর হারানোর অভিজ্ঞতার পরও কেন তিনি প্রতিবাদ করেননি জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তরে বলেন, "পুলিশরে বাধা দিয়া জেলে যামু নাকি"? এভাবে স্থানচ্যুতি গভার্নমেন্টালাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে; যা শাসিত দ্বারাই স্বাভাবিকীরনের পথ লাভ করে এবং শাসিত প্রতিরোধ না করে বরং এতে অংশগ্রহণ করে।

ঙ) নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবে স্থানচ্যুতি

গভার্নমেন্টালাইজেশন প্রক্রিয়া একই সাথে স্থানচ্যুতিকে নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবেও নির্মাণ করে; যাতে স্থানচ্যুতি প্রান্তিকীকরণের অভিজ্ঞতা তৈরি করেনা বরং খোদ প্রান্তিক ও দরিদ্র বস্তিবাসীর অংশগ্রহণ দ্বারা স্বাভাবিকীকরণের পথ লাভ করে । বস্তি উচ্ছেদ করার মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক মূলতঃ স্থানচ্যুতির বিষয়টিকে কাঠামোগতভাবে দৃশ্যায়িত করে তোলা হয়। অন্যদিকে এই স্থানচ্যুতি বস্তিবাসীদের জীবনে গতিশীলতার অন্য মাত্রা তৈরি করে, যা দৃশ্যমানতার আড়ালে থেকে যায়। একইভাবে বস্তির মত ক্ষুদ্র পরিসরে সরকার, রাষ্ট্র যখন উচ্ছেদ ঘটায় তখন তা নিরন্তর হয়ে ওঠার পাটাতন লাভ করে। গবেষিত স্থানচ্যুত বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সেই একই বস্তিতে ফিরে আসে এবং তাদের মধ্যে এ উপলব্ধিও রয়েছে যে, নতুন সরকার গঠিত হলে বস্তিবাসীদের পুণরায় উচ্ছেদ এবং স্থানচ্যুতির শিকার হতে হবে। কিন্তু তারপরও বস্তিবাসীরা সেই বস্তিতেই ফিরে আসতে চায়। স্থানচ্যুতির এহেন ধরণটি কুলসন (2003) স্থানচ্যুত এবং অন্য দেশে শরনার্থী হয়ে ওঠা উদ্বাস্তুদের অবস্থা বোঝার জন্য ব্যবহার করেন। এখানে তিনি উদ্বাস্তুদের নিজ দেশে ফেরার যে বোধ তার উপর জোর দিয়ে দেখান যে, এরা নিজেদের পরিচিতিকে তাদের ফেলে আসা পুরানো স্থানের সাথেই যুক্ত করে।

ঢাকার বেড়িবাঁধ বস্তিতে বসবাসরতদের অনুধাবনের প্রেক্ষিতে দেখা যায় নানা প্রক্রিয়ায় স্থানচ্যুতি তাদের জীবনে একটি নিরন্তর ও চলমান প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে, যা ব্যক্তির ভাবনার সাথে জড়িত। বস্তিবাসীরা উচ্ছেদের বাস্তবতা নির্মুল হবে এটা যেমন আশা করতে পারেনা, তেমনি পুণরায় উচ্ছেদকৃত হতে হবে এহেন ভাবনাকেও লালন করে। এখানে স্থানচ্যুতি বস্তিবাসীদের মধ্যে এমন এক মতাদর্শগত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যার জন্য বস্তিবাসীরা প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্রের দৃশ্যমান উচ্ছেদ কার্যক্রম বস্তিবাসীদের চেতনায় জায়গা করে নেয়। ফলে স্থানচ্যুতি কোন অনড়, সাময়িক বা স্থির কোন বিষয় নয় বরং উচ্ছেদের বাস্তবতা স্থানচ্যুতিকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে চলমান, গতিশীল ও নিরন্তর একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত করে তোলে।

৫. উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধটি স্থানচ্যুতি কীভাবে একটি চলমান এবং গতিশীল প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে তা স্পষ্ট করে। এই স্থানচ্যুতি বৈশিষ্ট্যগত ভাবে নিরন্তর, যেখানে স্থানচ্যুত বস্তিবাসীর কাছে ঐ বস্তি একটি শেকড়ের টান তৈরি করে এবং এই টান থেকেই স্থানচ্যুত হওয়ার পরও তারা পুণরায় ঐ বস্তিতেই আত্ম পুনর্বাসন ঘটায়। একই সাথে উচ্ছেদ এবং স্থানচ্যুতি বস্তি বাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রের গভার্নমেন্টালাইজেশনের বৈশিষ্ট্যকে কীভাবে ধারণ করে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। রাষ্ট্র কতৃক কাঠামোগতভাবে দৃশ্যমান করে তোলা উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্বয়ং যেমন একে আবশ্যিক করে তোলে, তেমনি বস্তিবাসীদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেয়ার প্রবণতার মাধ্যমেও এই প্রক্রিয়াটি নিরন্তর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে অভিবাসীত হয়ে আসা মানুষেরা প্রথমবারের মত স্থানচ্যুত হয়ে বস্তিতে তাদের বসবাসের জায়গা করে নেয়, কিন্তু সেখান থেকে বারংবার উচ্ছেদকৃত হওয়ার বিষয়টি তাদের মধ্যে নিয়মিত স্থানচ্যুতির অনুভূতি তৈরি করে। অন্যদিকে বস্তির স্থানের ক্ষমতা এবং বস্তির প্রতি শেকড়ের টানে এসব স্থানচ্যুতরা পুণরায় বস্তিতে ফিরে আসে, কিন্তু এই ফিরে আসাটাকে তারা কোনভাবেই আবার 'স্থায়ী' ভাবতে পারেনা। কেননা পুণরায় স্থানচ্যুত হতে হবে এহেন বাস্তবতার জন্য তারা প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে তারা স্থানচ্যুতির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধটিতে স্থানচ্যুতিকে একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই স্থানচ্যুতদের জীবনে শেষ কোন অভিজ্ঞতা নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলোচ্য প্রবন্ধটি এমএসএস থিসিস গবেষণার অংশ এবং এর তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক ড. জহির উদ্দিন আহমেদ' এর সহযোগিতার জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বিভাগীয় শিক্ষক ড. আকবার হোসেন ও মুজীবুল আনাম লাবীব এর পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বোপরি স্থানচ্যুতির চলমান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া সেইসব গবেষিতদের আন্তরিক ধন্যবাদ, যাদের অংশগ্রহণ ছাড়া গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

টীকা

[১] উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ দ্বারা মূলতঃ পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যাহারের সময় থেকে সূচিত কালকে বুঝায়। এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে আসছে এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবাদ এবং উত্তর-কাঠামোবাদী তত্ত্বের নানবিধ ধারা দ্বারা প্রভাবিত সেই সব মৌলিক কাজ বোঝাতে; যেগুলো অ-ইউরোপীয় সমাজে ঔপনিবেশিক পরিবেশনের চলমানতা প্রসঙ্গে মনোযোগী (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)।

[২] যদিও Displacement বা স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি জ্ঞানকান্ডের নিজস্ব পদ্বতি রয়েছে (সুত্র, Wikipedia), কিন্তু এই গবেষণা কর্মে মানব স্থানচ্যুতিকে অধ্যয়ন করা গয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিষয়াবলীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা কিনা স্থানচ্যুতিকে জোরপূর্বক অভিবাসনের একটি ক্যাটাগরি হিসেবে পাঠ করতে চায়।

[৩] Stephen Lubkamann জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তিনি ২০০২ সালে The Anthropology of Refugees & Displacement নামে একটি কোর্স চালু করেন যার সিলেবাসে তিনি স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত নৃবৈজ্ঞানিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুকে তুলে ধরেন।

[৪] সাধারণ অর্থে subculture হল সাংস্কৃতিক উপদল, যাদের মধ্যকার ঐক্যবদ্ধতার জন্য এদের মূল বা আধিপত্যশীল সাংস্কৃতিক দলের বিপরীতে নির্মাণ করা হয়। subculture সমূহের পরিচিতি নির্মাণ এবং অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এদের পরিধেয় বস্ত্র, পছন্দ-অপছন্দ, বাসস্থান, এথনিক পরিচিতি, ধর্ম ইত্যাদি আধিপত্যশীল দল দ্বারা ব্যাখ্যার বর্গ হিসেবে পরিণত হয় (Hall and Jefferson, 1993)।

[৫] কোন দেশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে ধারণ করার মধ্য দিয়ে multiculturalism বা বহুসাংস্কৃতিকতাবাদ এর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে, যেমন- কানাডা, বৃটেন, ইউএসএ, ভারত ইত্যাদি দেশ সমূহ। নীতিগতভাবে এই বৈচিত্র্য লালন করার মধ্য দিয়ে সেই দেশ উদারনৈতিক সময়ের সেক্যুলার মতাদর্শকেও লালন করে বলে দাবী করা হয়।

[৬] উত্তর ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক বনাম ঐতিহ্যবাহী, নির্দিষ্টতাবাদ বনাম সার্বজনীনতাবাদ ইত্যাদি বিষয়াবলী বিভিন্ন সংস্কৃতিকে hybrid গঠনে পরিণত করলেও সেই নির্দিষ্ট সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা মুছে যায়না, বরং অন্য সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলয়ে অনুবাদ করবার সাংস্কৃতিক যুক্তি এবং অন্য মাত্রা লাভ করে। এই প্রক্রিয়া অন্য সংস্কৃতিকে অভিযোজন করার পাশাপাশি নিজ সংস্কৃতিকে পুনঃমূল্যায়ন করার বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে সংস্কৃতিসমূহের সংমিশ্রণ বা hybridity ঘটায়, যেখানে মানুষ উভয় সংস্কৃতিকে লালন করে (Bhabha, 1994)।

[৭] ডায়াসপোরা প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় সেই জনগোষ্ঠি বোঝাতে, যারা এক স্থানে জন্মগ্রহন করে অন্য স্থানে বসবাস করছে। এরা জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের বাইরেও home বা homeland কে নির্মাণ করে এবং একই সম্প্রদায়ের বোধকে লালন করে । প্রথম দিকে ডায়াসপোরা বলতে ইসরায়েল থেকে জোরপূর্বকভাবে বিতাড়িতদের বোঝানো হত। বর্তমানে এই শব্দটির সাথে Immigrant, Refugee, Exile, Guest Worker, Ethnic Comminity ইত্যাদি বিষয়গুলোও জড়িত হয়ে গেছে (Vertovec; 1999, Tololian; 1991)।

[৮] নৃবিজ্ঞানে সামাজিক পুঁজিকে দেখা হয় ব্যক্তিদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তবে বিভিন্ন গবেষক ও একাডেমিকগণ একে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেন। ব্যাপক অর্থে বুর্দো (Bourdieu, 1977) সামাজিক পুঁজিকে বাস্তবিক বা কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পদের সমষ্টি বলেন, যা ব্যক্তি বা দল

প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠা পরিচয় ও স্বীকৃতির স্থায়ী সম্পর্কজালের মাধ্যমে অর্জন করে।

তথ্যপঞ্জী

Ahmed, Zahir and Gardner, Katy 2006. Degrees of Separation: Social Protection, Relatedness and Migration in Biswanat. Bangladesh in *Place, Social Protection and Migration in Bangladesh: A Londoni Village in Biswanath*. DRC Working Paper. Brighton: University of Sussex.

Appadurai, Arjun 1990. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In *Theory, Culture and Society 7* (2 and 3. July): 295-310.

Appadurai, Arjun 1991. 'Global Ethnoscape: Notes and Quires for a Transnational Anthropology. In Richard G. Fox ed. *Recapturing Anthropology*. Santa fe: School for American Research.

Asad, Talal 1971. *Anthropology and the Colonial Encounter*. London' Ithaka Press.

Bammer, Angelika 1994. *Introduction in Displacements: Cultural Identity in Questions*. Indiana University Press.

Bhabha, K. Homi 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.

Bourdieu, Pierre 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.

Clifford, James and George E. Marcus eds. 1986. *Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography*, Delhi: Oxford University Press.

Colson, Elizabeth 2003. Forced Migration and the Anthropological Response. *Journal of Refugee Studies. Vol. 16, No. 1*, University of California at Berkely.

COHRE and ACHR (2000) Mission report: we didn't stand a chance, forced evictions in Bangladesh. Geneva: *Centre on Housing Rights and Evictions, 2000.*

Foucault, Michel 1984. *The History of Sexuality. Vol. 3*: The Care of the Self, trans. Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1988.

Foucault, Michel 2001. Governmenatality in Michel Foucault: *Power*. J. D. Faubion ed. Harmondsworth: Penguin.

Geertz, Clifford 1983. Local Knowledge: Further Essays in *Interpretative Anthropology*. New York: Basic Books.

Gordon, Colin 1991. Governmental rationality: an introduction. In Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller eds. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Gupta, Akhil and James Ferguson 1992. Beyond 'Culture': Space, Identity and the Politics of Difference. *Cultural Anthropology: vol. 7*. American Anthropological Association.

Gupta, Akhil and James Ferguson 1997. Discipline and Practice: The Field as Site, Method and Location in Anthropology. In *Anthropological Locations: Boundaries*

and Grounds of a Field Science. Berkely, Los Angels and London: University of California Press.

Hall, Stuart and Tony Jefferson (1993). *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain*. Routledge, 1993

Jing, Jun 1996. *The Temple of Memories: History, Power and Morality in Chinese Village*. Standford; Standford University Press.

Lubkemann, Stephen 2002. *The Anthropology of Refugees and Displacement*. George Washington University. United States of America.

Malkki, H. Liisa 1992. Citizens of Humanity: Internationalism and the Imagined Community of Nations in *Diaspora. V0l-3, No.1.*

Malkki, H. Liisa 1992. National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees. In *Cultural, power, place: explorations in critical anthropology*. Duke University Press.

Malkki, H. Liisa 1995. *Purity and Exile: Violence, Memory and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*. Chicago: University of Chicago Press.

Malkki, H. Liisa 1997. Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism and Dehistorilization. In K. F. Olwig and K. Hastrup eds. *Siting Culture: The Shifting Anthropological Object*. New York: Routledge.

Mehta, Lyla and Jaideep Gupte 2003. Whose Needs are Right? Refugees, Oustees and the Challenges of Rights-Based approaches. Iin Forced Migration Development Research Centre on Migration, Globalization and Poverty Arts C-226, Working Paper T4, *Institute of Development Studies,* University of Sussex, Brighton.

Peteet, M. Julie 1995. Transforming Trust: Dispossession and Empowerment among Palestinian Refugees. In E.V. Daniel and J. Knudsen eds. *Mistrusting Refugees*. Berkely: University of California Press.

Roy, S. 2001. Refugees and Human Rights: The Case of Refugees in Eastern and North-Eastern States of India. In *Refugees and Human Rights: Social and Political Dynamics of Refugee Problem in Eastern and North-eastern India*. New Delhi: Rawat.

Said, Edward 1978. *Orientalism*. New York: Vintage.

Said, Edward 1979. *Zionism from the Standpoint of its Victims*. Social Text Cambridge: Harvard University Press.

Tololian, Khachig 1999. The Nation State and Its Others: in Lieu of a Preface, *Diaspora 1(1):3-7.*

Vertovec, Steve and Cohen Robin eds. 1999. *Migration, Diasporas and Transnationalism Cheltenham:* Edward Elgar ed. 1999, pp. 663

আহমেদ, রেহনুমা ও মানস চৌধুরী ২০০৩, নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতি। একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ ঢাকা।

গুহ, ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম ২০০৫, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

রশীদ, মামুন-উর ২০০৬, বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতায় বস্তি উচ্ছেদ: একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ। ব্রাক, মহাখালী, ঢাকা।

সুলতানা, ফারহানা ২০০৯, স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্য। বাংলাদেশ নারী ও প্রগতি সংঘের ষান্মাসিক জার্নাল, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১০, দি লেমিনেটরস: ঢাকা।

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ৪১-৫২
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞানে এথনিসিটি পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ হোসেন*

ভূমিকা

এথনিসিটি (Ethnicity) শব্দটির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক। উনিশ শতকের সত্তুর দশকের আগে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা কাজগুলোতে স্বতন্ত্রভাবে এথনিসিটি সংক্রান্ত আলোচনা কমই ছিল। উত্তর ঔপনিবেশিক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে এথনিক ক্লিনজিং (ethnic cleansing) এবং এথনিক সংখ্যালঘুদের আন্দোলনের ফলে উনিশশত সত্তুর দশকের মধ্যভাগে এথনিসিটি প্রত্যয়টি নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানে এথনিসিটি নিয়ে তাত্ত্বিক কাজ শুরু হয়। এথনিসিটিকে এসময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, পরিচিতি নির্মাণ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, বর্ণ সম্পর্ক, জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয় (Sokolovskii and Tishkov, 1996:190)। এথনিসিটিকে দেখার এসময়কার প্রবনতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এথনিক সীমানা কেন্দ্রীক বিতর্ক, জাতি ও জাতীয়তাবাদ দ্বারা আধিপত্যশীল জাতি রাষ্ট্রে এথনিক সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য নির্মাণ; ইত্যাদি। এথনিসিটির সাথে সম্পর্কিত করে জাতি ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গেও রয়েছে বিতর্ক। ফলে দেখা যাচ্ছে অঞ্চল, সময় ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এথনিসিটি পাঠের ধরণও বদলে যায় (Banks,1996)। এই প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে এথনিসিটিকে দেখার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি; যা আবার একই সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নৃবিজ্ঞানের যে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য, তার সাথে যুক্ত; সেসব বিবিধতর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষনের চেষ্টা করা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানে এথনিসিটি পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

নৃবিজ্ঞানে এথনিসিটি অধ্যয়নে বিভিন্ন সময়ে তিন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে যেমন; প্রাইমরডিয়ালিস্ট, ইন্সট্রোমেন্টালিস্ট ও কন্সট্রাক্টিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি (Banks, 1996)। বিভিন্ন রাষ্ট্রে নৃবিজ্ঞানের যে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য তার সাথে নৃবিজ্ঞানের এথনিসিটিকে পাঠ করার ধরণও বদলে যায়। ফলে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থানকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে কখনো বিবর্তনবাদী ধারণা থেকে, কখনো আধুনিকতা বা আধুনিকতাবাদী তত্ত্বের সাহায্যে এবং কখনো এথনিসিটির পরিস্থিতি নির্ভর (situational) ব্যাখ্যা হাজির করা হয় (Sokolovskii and Tishkov (1996:190)। অন্যদিকে অনেকে জাতীয়তাবাদের সাথে এথনিসিটির যোগাযোগের সূত্রগুলো অনুসন্ধান করেন। প্রাইমরডিয়ালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এথনিক পরিচিতির ভিত্তি গ্রথিত রয়েছে আদি একটি দল বা সংস্কৃতির সাথে তার আদিম যুক্ততার মধ্যে। এই তত্ত্বানুসারে মনে করা হয় যে, এথনিসিটির পরিচিতির ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব, মূর্তমান ভিত্তি রয়েছে। এটি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমতঃ এথনিসিটিকে জৈবিকভাবে নির্ধারিত বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এথনিসিটিকে সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের উৎপাদ হিসেবে দেখা হয়। এদের ধারণাগত পার্থক্য নিহিত রয়েছে মানব প্রকৃতি এবং সমাজের

* এসিস্টেন্ট ফেলো, রিসার্চ এন্ড পলিসি ডিভিশন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ইমেইলঃ bidhu2001@yahoo.com